জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং— ২৫, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২৫শে মে, ১৯৯৬ইং, শনিবার

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbatthya Chattagram Janasamhati Samiti

Issue No.—25, 6th year, 25th May, 1996, Saturday.

সম্পাদকীয়

বিশ্বের পরিবেশ আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মানুষ আপন স্বার্থে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে তাতে ভূ-মণ্ডলের পরিবেশগত যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা আজ মানব জাতির অস্তিত্বের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৎসত্বেও বিশ্বে আজ অব্যাহত রয়েছে ব্যাপক বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও তেজস্ক্রিয় দূষণ। আর এরূপ ক্রমাগত দূষণের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, অম্লবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ভূমিতে মরুময়তা, মৎস্য ও প্রাণীকূলের অস্বাভাবিক অবলুপ্তি, ক্যান্সার, হাঁপানী, রক্তচাপজনিত ব্যাধি, কিডনি সমস্যা, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ।

বিশ্বের পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট এ'সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমানে বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে ও কোটি কোটি টাকার ধন সম্পত্তি বিন্যস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দেশের সকল প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি, পানি ও বনের উপর অস্বাভাবিক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে দেশের বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য যে, বিগত দুই দশকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও বনাঞ্চলে এই অস্বাবিকভাবে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময়ে। এই অনুপ্রবেশকারীরা বর্তমানে সরকারের প্ররোচনায় ও মদতে জুম্মদের ভূমি, বাগ-বাগিচা বেদখল করে নিয়েছে এবং জেলার বিস্তৃত বনাঞ্চল ধ্বংস করে চলেছে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বিগত বছরগুলোতে জেলার জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পার্বত্য অঞ্চলের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে ও বাৎসরিক গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পোড়া মাটি নীতির আওতায় ব্যাপক বৃক্ষনিধনের ফলে বর্ষার সময় ব্যাপক ভূমিক্ষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। তাই বর্ষায় সামান্য বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিচ্ছে আবার খরার সময় সেচের পানির অভাব দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। তাছাড়া পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে অনেক প্রজাতির বন্য প্রাণীরও অবলুপ্তি ঘটছে।

আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের অনুসৃত জুম্মজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণের কার্যক্রমের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের এই পরিবেশগত সমস্যা দিন দিন আরো ব্যাপক আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে শান্তিবাহিনীকে কোণঠাসা করতে সরকারী সেনাদের শুষ্ক মৌসুমে বনে জঙ্গলে অগ্নিসংযোগ, চার শতাধিক সামরিক ক্যাম্পের চারপাশ ও রাস্তার দু'ধারে জঙ্গল কাটা, সরকারী দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল তুসা গোষ্ঠীকে পোষণের নামে গাছের পারমিট প্রদান প্রভৃতির ফলে ব্যাপক বন ধ্বংস পরিবেশগত

ভারসাম্যহীনতাকে আরো ত্বরান্বিত করছে।

বর্তমানে বিশ্বকে গ্রীন হাউজ এফেক্ট থেকে মুক্ত রাখার জন্য যখন পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন চলছে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে ব্যাপক বৃক্ষনিধন। মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের এই ব্যাপক অপরিকল্পিত বৃক্ষনিধন ও লুণ্ঠন অচিরেই বন্ধ না হলে এক দশকের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃক্ষশূণ্য অঞ্চলে পরিণত হবে। এতে প্রকৃতির সন্তান দশভিন্ন ভাষাভাষি জুম্মজাতিসত্তাগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে নানা সমস্যা জটিলতর রূপলাভ করতে পারে। অতএব জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য তথা বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে পার্বত্য অঞ্চলে বৃক্ষনিধন ও বন ধ্বংস রোধ অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের জুম্ম জনগণকে সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে বন তথা পরিবেশকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ধ্বংস

● শ্রীজগদীশ

ইদানিং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘনফুট অবৈধ কাঠ অন্যান্য জেলায় পাচার হচ্ছে। অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে এই বৃক্ষনিধনের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে সবুজ বনাঞ্চল আজ বৃক্ষহীন হতে চলেছে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল দেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল। এখানে সংরক্ষিত ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের পরিমাণ যথাক্রমে ১,০০১ ও ৩,৪০০ বর্গমাইল। এই জেলার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রধান সংরক্ষিত বনাঞ্চল অবস্থিত। দুইশত বৎসরের এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গর্জন, গামার, চাপালিশ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ রয়েছে। আর এই সংরক্ষিত গহীন অরণ্যে রয়েছে শত শত প্রজাতির পাখী ও জীবজন্তু। মূল্যবান কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি বনজ সম্পদে ভরপুর পার্বত্য বনাঞ্চল ছিল দশভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লীলাভূমি। উর্বর বনাঞ্চলে জুমে উৎপন্ন ধান, তিল, তুলা, ফলমূল, বনাঞ্চলের পশুপাখী ও ছোট-নালার মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তু কোনদিন জুম্মদের অভাব ঘটেনি।

কিন্তু পার্বত্য বনাঞ্চলের এই সব প্রাকৃতিক সম্পদই আজ জুম্মদের সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা ও বহিরাগত ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আজ এই পার্বত্য বনজ সম্পদ বিশেষ করে কাঠ একচেটিয়া আহরণ করে জেলার বনাঞ্চলকে উজাড় করে ফেলছে। এই দুর্নীতিপরায়ণ চক্র প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার অবৈধ কাঠ আজকেলার বাহিরে পাচার করে চলেছে। পার্বত্য বনাঞ্চলের এই বনজ কাঠ অবৈধ আহরণ যেমন জুম্মদের জীবনে প্রাচুর্য্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্যতাকে হরণ করে অন্য দিকে

জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যতাও নষ্ট করছে।

বর্তমানে পার্বত্য বনাঞ্চল থেকে চার প্রকারে কাঠ জেলার বাইরে বৈধ ও অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে। (১) গোল কাঠ (২) রদ্দা ও বল্লী (৩) জ্বালানী কাঠ ও (৪) আসবাবপত্র। ১) গোল কাঠ ঃ— প্রধানতঃ সংরক্ষিত বনসমূহ থেকে খুব বড় বড় আকারের গোল গাছ ও পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট বিভিন্ন বাগান থেকে সেগুন কাঠ ব্যাপকভাবে আহরণ করা হচ্ছে। ফলে দুইশত বৎসরের সংরক্ষিত কাচালং বনাঞ্চল, মাইনী বনাঞ্চল, রেং খং বনাঞ্চল, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী বনাঞ্চল আজ বলতে গেলে বৃক্ষশূণ্য হয়ে পড়েছে। আর কয়েক দশক আগে সৃষ্ট বিভিন্ন সেগুন বাগানও নিঃশেষ হতে চলেছে।

২) রদ্দা ও বল্লী ঃ— জেলার সব সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল থেকে রদ্দা আকারে কড়ই, গামার, জারুল, মেহগনি, চাপালিশ, গজারি, তৈলচুড়, চাম্পাফুল ও যে কোন জাতের গাছ রদ্দা আকারে ব্যাপকভাবে আহরণ করা হচ্ছে। এই রদ্দা কাঠ আহরণই সবচেয়ে ক্ষতি করছে সারা জেলার বিস্তৃত সংরক্ষিত ও রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলকে। এই রদ্দা কাঠ সুবিধামতো আকারে ট্রাকে করে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ঘনফুট কাঠ পাচার করা হচ্ছে। বর্তমানে যে হারে বৃক্ষ নিধন চলছে এভাবে চলতে থা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় মাপের কে গাছের অস্তিত্ব বনাঞ্চলে পাওয়া ভার হবে।

৩) জ্বালানী কাঠ ঃ— পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ধ্বংসের অন্যতম কারণ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ। বিশেষ করে জেলা সমূহের বিভিন্ন স্থানে ইটের ভাটায় প্রতিদিনঅবাধে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। সূত্রে প্রকাশ, সরকারী আইন অমান্য করে বিভিন্ন ফসলী জমির কাছে লাইসেন্সহীন অনেক ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে। এইসব ইটের ভাটায় কয়লার পরিবর্তে কোন রকম বাছবিচার না করে মূল্যবান কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। ইহা ছাড়া জেলার বাইরে ইটের ভাটার জন্য শত শত ট্রাক জ্বালানী কাঠ অন্য জেলায় অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে। বনাঞ্চলের ছোট বড় সকল রকমের গাছ জ্বালানী কাঠ হিসেবে আহরণ করা হচ্ছে। এই ব্যাপক জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও পাচারের ফলে অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল লতাগুল্ম আচ্ছাদিত তৃনভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

৪) আসবাবপত্র ঃ—আসবাবপত্র হিসেবেও অনেক কাঠ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাচার হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আসবাবপত্র হিসেবে অতিরিক্ত অবৈধ কাঠ অন্য জেলায় পাচার করছে। এক্ষেত্রে বিডিআর ও আর্মির কর্মকর্তাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী অগ্রগণ্য। বিশেষ করে মূল্যবান সেগুন কাঠই এভাবে বেশী পাচার হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এইসব অবৈধ কাঠ প্রধানতঃ সড়ক পথে ট্রাকে ভর্তি করে রাত্রে পাচার করা হচ্ছে। প্রতি ট্রাকে ৩০০ (তিনশত ঘনফুটের বেশী কাঠ ভর্তি করে চালান দেয়া হয়। এছাড়া লক্ষ্মীছড়ি ও মহালছড়ি থানার বনাঞ্চলের কাঠ ধুরুং,ওসত্তাখাল, লামা ও আলিকদমের কাঠ মাতামুহুরী নদী এবং নাক্ষ্যংছড়ি বনাঞ্চলের কাঠ বাঁকখালী নদী পথে পাচার হচ্ছে। এই কাঠ পাচারে জড়িত রয়েছে এক শ্রেণীর অসাধু

বাঙালী কাঠ ব্যবসায়ী। তারা পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত বনবিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে নামে মাত্র সিওআর, পারমিট টিপি দিয়ে দিনের বেলায় এবং রাত্রে বিভিন্ন চেকপোষ্টে নগদ ঘুষ দিয়ে কাঠ পাচার করছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রতি ট্রাক সেগুন কাঠের জন্য প্রতি চেক্‌পোষ্টে ১৫০০-২০০০ টাকা এবং প্রতি ট্রাক জ্বালানী কাঠের জন্য ৫০০-৬০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। তবে এই ঘুষের হার বিভিন্ন সড়ক পথে ও চেক্‌পোষ্টে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই ব্যাপক ও অপরিকল্পিত বৃক্ষ নিধন, আহরণ ও পাচারের বিষয়ে দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রতিদিন প্রতিবেদন বেরুচ্ছে। এইসব প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বিশেষ করে সড়ক পথে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কাঠ আহরণ ও পাচার হওয়ার ফলে খাগড়াছড়ি জেলার যেসব বনাঞ্চলে বৃক্ষ শূন্য হচ্ছে সেগুলো হলো মাটিরাঙ্গা থানার- তাইন্দং, তবলছড়ি, সিংহপাড়া, বাঘমারা, বগাপাড়া, মোল্লাবাজার, নতুন বাজার, গৌরাঙ্গপাড়া, করল্যাছড়ি, বড়নাল, রামশিরা, দেওয়ানপাড়া, গোমতী, শান্তিপুর, বেলছড়ি, বামগুমতি, গড়গড়িয়া-নাল, আলুটিলা, পলাশপুর, খেদাছড়া, সমিতিটিলা, অযোধ্যা, কালাপানি, বাইল্যাছড়ি, সাপমারা ওয়াচু, আদর্শগ্রাম, হাতিয়াপাড়া, তৈমাতাই, দলদলি নারাছোর, নারায়নপাড়া ও গুইমারা বনাঞ্চল। মানিকছড়ি থানার—বাটনাতলী, তাইনছড়ি, সিংগুড়া ছড়া, যোগ্যাছড়া, ডলু, মগাইছড়ি, মজুংগি পাড়া, রাঙ্গাপানি, গচ্ছাবিল, হাতিমুড়া বনাঞ্চল। লক্ষীছড়ি থানার— জারুলছড়ি, তুল্যাতলী, যুগাছড়ি, ময়ুরহিল, দুরছড়ি, বানরকাটা, ডান বানরকাটা বনাঞ্চল। দীঘিনালা থানার— ছোটমেরুং, বড়মেরুং, বাবুছড়া, জামতলী ও বাঘাইছড়ি বনাঞ্চল। মহাল-ছড়ি থানার—গোয়াইছড়ি, ডেবালছড়ি, সিন্দুকছড়ি, কালাপাহাড়, ধর্মটিলা ও মাইছছড়ি বনাঞ্চল। রামগড় থানার— পাতাছড়া, জালিয়াপাড়া, খাগড়াবিল, বাগুখালী, হাফছড়ি, মাক্রো, বড়ইছড়ি, পরশুরাম ঘাট ও বড় পিলাক বনাঞ্চল। পানছড়ি থানার— লোগাং, ধুতুকছড়া, করল্যাছড়ি, কুড়াদিয়া, শান্তি-পাড়া, পঞ্চরাম পাড়া, ধমদম, উল্টাছড়ি ও পুজগাং বনাঞ্চল বান্দরবান জেলার যেসব বনাঞ্চল থেকে কাঠ আহরণ ও পাচার হচ্ছে—তৈন ডলুছড়ি রেঞ্জ অশ্রেণী ভুক্ত বনাঞ্চল, গজালিয়া, আজিজ নগর বনাঞ্চল, সরই ও বমুর বনাঞ্চল, লামা, আলিকদম, নাক্ষ্যংছড়ি বনাঞ্চল, সংঘ মাতামুহরী বনাঞ্চল। রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু থানার সব বনাঞ্চল, বাঘাইছড়ি থানার কাচালং বনাঞ্চলের বাঘাইহাট রেঞ্জ, সুবলং বনাঞ্চল ও দক্ষিণ বন বিভাগের আলীখিয়াং রেঞ্জ, চাইন্দা বাগান (সেগুন), কাপ্তাই ও দঃ রাজুনিয়া-খুরুশিরা বন রেঞ্জ, কোদালা সেগুন বাগান ও কাপ্তাই বনাঞ্চল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বন ধ্বংসের কারণ পর্যা-লোচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ আহরণই পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ধ্বংসের প্রধান কারণ। বর্তমানে যে হারে পার্বত্য বনাঞ্চল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গোল কাঠ, রদ্দা কাঠ, বল্লী কাঠ ও জ্বালানী কাঠ আহরণ করা হচ্ছে এই হারে কাঠ

আহরণ অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে পার্বত্য বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য অনেকে জুম চাষকে বন ধ্বংসের প্রধান কারণ হিসেবে মনে করেন। কিন্তু জুম জনগণের যুগ যুগ ধরে জুম চাষের বাস্তবতার আলোকে এটা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, জুম চাষ বনধ্বংসের প্রধান কারণ কখনই নয়। যেহেতু বর্তমান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ আহরণের পূর্বে জুম জনগণ যুগ যুগ ধরে জুম চাষ করে আসলেও পার্বত্য বনাঞ্চল আজকের মতো ধ্বংসের মুখোমুখি হয়নি। বস্তুতঃ জেলার অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে জুম চাষ হয়ে থাকে এবং কোন স্থানের একবার জুম চাষের পর কমপক্ষে ৪/৫ বৎসর যাবৎ ঐ স্থান পতিত রাখা হয় বনাঞ্চল গড়ে উঠার জন্য। এভাবে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ৪/৫ বৎসর অন্তর আবর্তন পদ্ধতিতে জুম চাষ করা হয়। এই আবর্তন পদ্ধতিতে জুম চাষের ফলে সংরক্ষিত বনের কোন ক্ষতিই হয়না। তদুপরি প্রধানতঃ বাঁশ বনেই জুম চাষ করা হয়। এতে গাছের ক্ষতি কমই হয়ে থাকে। কাজেই জুম চাষকে বর্তমান বনভূমি ধ্বংসের জন্য প্রধানতঃ দায়ী করা যায়না।

পার্বত্য বন ধ্বংসের তৃতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে– অনুপ্রবেশকারীদের জমি আবাদীকরণ ও সামরিক বাহিনীর চলাচলের পথের দু'ধারে ব্যাপক জঙ্গল কাটা ও বিভিন্ন ক্যাম্পের চারিপাশের গাছাদি কাটা। নিরাপত্তার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক সামরিক ক্যাম্প ও চৌকির এ'রূপ জঙ্গল কেটে শত শত একর বন এমনকি নানা ফলের বাগান পর্যন্ত ধ্বংস করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এই বৃক্ষ নিধন আজ শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে না। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বন ধ্বংস কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। এদেশের বনাঞ্চল ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়েছে। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশে ৩০% বনাঞ্চল ছিল। ১৯৫২ সালে তা নেমে আসে ২৭%এর ১৯৭০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮%। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বন ধ্বংস আরো ত্বরান্বিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কেবলমাত্র ৬.৪৬% বনাঞ্চল রয়েছে। বস্তুতঃ সারা বিশ্বে এই বন ধ্বংস অব্যাহত রয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিলের বিশ্ব বিখ্যাত রেইন ফরেষ্ট এর ৭০% বন ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্য এক হিসেবে দেখা গেছে যে, বিশ্বে প্রতিদিন ১৫০০ হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। আর নতুন বন সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র ১০০ হেক্টর। অর্থাৎ প্রতিদিন নীট বন ধ্বংসের পরিমাণ হচ্ছে ১৪০০ হেক্টর। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, ঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে হিমালয় ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ধ্বংসের ফলে ইতিমধ্যে জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হয়েছে। এই ব্যাপক বন ধ্বংসের ফলে পার্বত্য বনাঞ্চল থেকে অনেক প্রজাতির পাখী ও জীবজন্তু আজ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সবুজ বনানী পার্বত্যাঞ্চল আজ মরুভূমির মত ধূসর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে পাহাড়ের জমির ব্যাপক ভূমিক্ষয় ও নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়ে বর্ষার সময় সামান্য বৃষ্টিতে বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে খরার সময় পানীয় জল ও সেচের পানির সংকট

পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিগত চল্লিশ দশক পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে ৮০% ভাগ জমি ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য জেলা হতে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকায় অনেক সমতল জমিও বনভূমির আওতাধীন ছিল। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর ২২.৩৪ বর্গমাইল সংরক্ষিত বন জলমগ্ন ও ৪৪.৭৫ বর্গমাইল ধ্বংস হয়। আর অশ্রেণীভুক্ত বন জলমগ্ন হয় ২৩৪ বর্গমাইল। ফলে ২৫৪ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়ে এক কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় এবং ১৮,০০০ জুম্ম পরিবার তথা ১ লাখ জুম্ম উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। এইসব উদ্বাস্তু জুম্মরা কাচালং, রেংখং, সুবলং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ও সারা জেলার বিস্তৃত অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে, এতে একদিকে জলমগ্নতা ও অন্যদিকে নূতন জনপদ সৃষ্টিতে বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পায়।

কাপ্তাই বাঁধের এই বিপুল পরিমাণ বন ধ্বংস ও গত দুই দশকে একচেটিয়া বাঁশ, কাঠ আহরণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে পড়েছে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে এখানে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সূত্রে জানা গেছে যে, ১৯৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৪ সালে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে। সূত্র জানায়—১৯৯৩ সালের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মে মাসে ৪৭৬ মিঃ মিঃ, জুন মাসে ৫৫২ মিঃ মিঃ, জুলাই মাসে ৬৬৪ মিঃ মিঃ এবং ১—১০ আগষ্ট পর্যন্ত ২৮০ মিঃ মিঃ। অথচ ১৯৯৪ সালে বৃষ্টিপাত হয় মাত্র মে মাসে ৪৭ মিঃ মিঃ, জুন মাসে ১৯৪ মিঃ মিঃ, জুলাই মাসে ৪২৯ মিঃ মিঃ এবং ১—১০ আগষ্ট পর্যন্ত ৭৯ মিঃ মিঃ মাত্র।

আর স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক সূত্র জানায় যে, রাঙ্গামাটি জেলার যেসব কৃষি জমিতে চাষ করা হয় তার দুই তৃতীয়াংশ কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি। বর্তমানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় প্রতি বছর অকাল বন্যা ও খরায় ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুতঃ বন ধ্বংসের কারণে ভূমিক্ষয় ও পাহাড় ধ্বসে ছোট ছোট নদীগুলো ভরাট হয়ে গেছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতে শুরু হয় বন্যা। আর শুষ্ক মৌসুমে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় সেচ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাঙ্গামাটি জেলার ৫টি থানার প্রধান যোগাযোগ জলপথ হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়। এতে মালামালের পরিবহনের অসুবিধা দেখা দেয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায় আর উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের দাম কমে যায়।

আবার অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় ও পাহাড় ধ্বসের ফলে কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রকৌশলীর মতে কাপ্তাই হ্রদের পলিমাটি ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বাঁধের নীচে ফেলে দেয়া হলে তা চট্টগ্রাম বন্দরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। আবার ড্রেজিং করে পলিমাটি হ্রদের আশেপাশের পাহাড়ে তুলে দেয়া হলে এক বছরের মধ্যে বর্ষা মৌসুমে তা আবার হ্রদে জমা হবে। এই পলিমাটির ফলে কাপ্তাই বাধ পরিকল্পনায় বাঁধ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির মেয়াদ ১৪৫ বৎসর ধরা হলেও গত ৩৫ বৎসরের মধ্যে সেসব সুবিধাদি

প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই কাপ্তাই হ্রদের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া না হলে আগামী ১০/১৫ বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্তমানে যে ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন ও বন ধ্বংস করা হচ্ছে এতে জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যতা আরো বিপর্যস্ত হবে। আর এর ফলে যে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের পরিবেশ দূষণ আরো ত্বরান্বিত হবে এবিষয়ে বর্তমান সরকারের কোন মাথাব্যাথা আছে বলে মনে হয়না। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন সংরক্ষণের কোন সরকারী পদক্ষেপ বিগত দু'দশকে পরিলক্ষিত হয়নি। সারা দেশের বন নিঃশেষ হওয়ার পর আজ সবার দৃষ্টি পড়েছে এই জেলার বনাঞ্চলের উপর। তাই এখানে আজ চলছে বনজ সম্পদের লুঠপাটের প্রতিযোগীতা। আর জনসংহতি সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে দমনের নামে লক্ষাধিক সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ও সামরিক প্রশাসনের প্রাধান্য এই বনজ সম্পদের লুঠপাটকে আরো সহজসাধ্য করে তুলেছে। তাই এ'জেলার সমতল ও অসমতল জমি বেদখলের সাথে সাথে জুম্ম জনগণের শান্তিবাহিনী দমনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত বনাঞ্চলকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে নয়, এতদঞ্চলের বনাঞ্চল বা পরিবেশকে নয়, এ'জেলার মাটিই বেদখল হচ্ছে সরকারের কাম্য যেখানে গড়ে উঠবে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের নিশুড বসতি। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম আর জুম্মদের আবাসভূমি থাকবেনা, হবে বাঙালী অনুপ্রবেশকারীদের আবাসভূমি।

সংগ্রামই অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ

● শ্রী উজ্জ্বল

বিশ্বের বঞ্চিত, নির্যাতিত নিপীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলো আজ সবার অধিকার সচেতন হয়ে উঠছে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে গেলে ও স্বকীয় জাতীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যে একমাত্র অবলম্বন, এটা আজ দুনিয়ার নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও শাসিত জাতিগুলোর কাছে অস্পষ্ট নয়। তাইতো আজ সমগ্র বিশ্বে চলছে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার সংগ্রাম এবং নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণও এর থেকে ব্যতিক্রম নহে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্মরণাতীত কাল হতে জুম্ম অধ্যুষিত আবাসভূমি এবং জুম্মরাই এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু যুগ যুগ ধরে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর নির্মম নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ, অত্যাচার ও

নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আসছে এই অঞ্চলের সরলপ্রাণ জুম্ম জনসাধারণ। সেই সপ্তদশ শতকের মোগল শাসনামল হতে বর্তমান বাংলাদেশ শাসনামল অবধি অবসান হয়নি জুম্ম[illegible] শোষক গোষ্ঠীর নিপীড়ন ও শোষণ, [illegible] জুম্মদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্র, ভাঙেনি পরাধীনতার শৃংখল। তবে এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, যেখানে অত্যাচার সেখানে গড়ে উঠে প্রতিরোধ। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে জুম্ম জনগণও আজ প্রতিরোধ করে যাচ্ছে—বিজাতীয় হানাদার শাসক-শোষক ও অত্যাচারীকে। বিগত সত্তর দশকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ গড়ে তুলেছে উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ। সূচিত হয়েছে জুম্ম জনগণের আজকের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন।

ইতিহাস প্রমাণ দেয়—দুনিয়ার কোন শাসক-শোষক গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় যেমনি কোন অধিকার ফিরিয়ে দেয়নি, তেমনি শাসিত-শোষিত ও নির্যাতিত জাতিগুলোও আপনা-আপনি পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। পৃথিবীতে আজ যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সুদূর অতীতে কোন এক সময় তাদেরও পৃথিবীর বুকে পরাধীন ও নিপীড়িত জাতি হিসেবে শাসন-শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে জীবন কাটাতে হয়েছিল। জাতির সেই পরাধীনতাকে তারা কি সহজভাবে মেনে নিতে পেরেছিল? নিশ্চয় পারেনি। সকল স্তরের জনসাধারণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসক গোষ্ঠীর সকল প্রকার জাতিগত শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়তে হয়েছিল। এইসব অন্যায় শাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতি পদে পদে গড়ে তুলতে হয়েছিল প্রতিরোধব্যূহ। শত শত তাজা প্রাণ দিতে হয়েছিল। শাসক গোষ্ঠীর নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বয়ে গিয়েছিল রক্তের বন্যা। তবেই না তারা ছিনিয়ে এনেছে অধিকার, অর্জন করেছে স্বাধীনতা, স্বদেশ থেকে শাসক-শোষক গোষ্ঠীকে করেছে বিতাড়িত, আর গোটা জাতীয় জীবনে এনেছে মুক্তির জয়গান।

উদাহরণস্বরূপ ভিয়েতনামের কথা বলা যায়। আজকের স্বাধীন (সমাজতান্ত্রিক দেশ) ভিয়েতনামও একসময় পরাধীন ছিল। যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ভিয়েতনামের মানুষদের উপর নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের এই অন্যায়, নির্মম শোষণ ও বঞ্চনা ভিয়েতনামের জনসাধারণ কি নীরবে সহ্য করেছিল? না তারা সহ্য করেনি। ভিয়েতনামীদের সেই পরাধীনতার গ্লানি আপনা-আপনি কি দূরীভূত হয়েছিল? না পরাধীনতার গ্লানিও আপনা-আপনি কেটে যায়নি। ভিয়েতনামের সকল স্তরের জনসাধারণকে লৌহ দৃঢ় শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে, ইস্পাত কঠিন ঐক্যে সংগঠিত হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শত শত জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। অনেক রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। শত শত মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছিল আর অগণিত ভিয়েতনামীদের অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও আধপথে থেমে থাকেনি ভিয়েতনামীদের

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। যতদিন মাতৃভূমি থেকে শত্রুর বিতাড়ন সম্ভব হয়নি, জাতির পরাধীনতার শৃংখল ছারখার হয়নি, সাধের স্বপ্ন জাতির "স্বাধীকার" কায়েম হয়নি ততদিন পর্যন্ত লড়েছিল ভিয়েতনামের আপামর জনসাধারণ।

অন্যদিকে বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) কথা যদি বলা যায় তাতেও এর ব্যতিক্রম নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) শাসক গোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষের উপর যে জাতিগত শাসন-শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা চালিয়েছিল সে সবের বিরুদ্ধে এদেশের সর্ব স্তরের মানুষদের সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছিল। তাইতো ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বের এইসব নির্যাতিত, নিপীড়িত জাতির মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে দেয় যে, "সকল স্তরের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন জাতির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল হতে পারে না।" স্তর বিশেষের আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্দোলনের গতিকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার সফল ভূমিকা থাকলেও সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যতীত আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতা অর্জনে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তাই জুম্মদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতাও বহুলাংশে নির্ভর করছে সকল স্তরের জুম্ম জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর। শুধু স্তর বিশেষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নয়। তাই আজ জাতীয় জীবনের বাস্তবতার দাবী হচ্ছে—আসুন আমরা অধিকতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা লক্ষ্যে রেখে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হই।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের জুম্ম জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত যুব সমাজের আজ পৃথিবীর বিভিন্ন পরাধীন জাতির মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস থেকে নূতন করে শিক্ষা নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। "অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়" এটা আজ ইতিহাস প্রমাণিত। কারোর জন্য কেউ সংগ্রাম করে দেয় না। নিজের জন্য নিজেকেই সংগ্রাম করতে হয়, লড়াই করতে হয় এবং সংগ্রাম করেই অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে হয়। যে কোন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সেই জাতির জনগণই হচ্ছে প্রধান শক্তি। সুতরাং, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণেরও আজ নূতন করে ভাবতে হবে যে, নিজেরাই হলো নিজেদের মুক্তিদাতা। অন্য কেউ নয়। আজ এই কথা মনে রাখতে হবে যে, "আজকের প্রজন্মের জীবনমরণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আগামী দিনের প্রজন্মের জাতীয় বৈশিষ্ট—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশে নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব।"

সংবাদ

বাঘাইছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাঁয়তারা

অতি সম্প্রতি একজন মুসলমান বাঙালী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমান বাঙালীরা বাঘাইছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়— গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, মোঃ ইসহাক নামে এক মুসলমান বাঙালী বাঘাইছড়িতে নিখোঁজ হয়ে যায়। তার এই নিখোঁজ হওয়ার জন্য মুসলমানেরা কোন প্রমাণ ছাড়া শান্তিবাহিনীকে দায়ী করে। কিন্তু শান্তিবাহিনীকে দায়ী করলেও নিখোঁজ ব্যক্তিকে বের করে দেয়ার জন্য মুসলমান বাঙালীরা স্থানীয় জুম্মদের উপর চাপ দিতে থাকে। গত ১২ই মার্চ, বাঘাইছড়ি থানার বাঙালী-ছাত্র-ঐক্য পরিষদ বাঘাইছড়িতে এক সভায় ১৫ই মার্চের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে পাওয়া না গেলে বাঘাইছড়িকে অচল করে দেয়া ও অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এরপর ১৬ই মার্চ অনুষ্ঠিত সভায় বাঙালী-ছাত্র-ঐক্য পরিষদ আবার ঘোষণা করে যে, ২৮শে মার্চের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত পাওয়া না গেলে সকল জুম্মদের জন্য বাজার, অফিস আদালত সবকিছু বন্ধ করে দেয়া হবে। এদিন মুসলমান বাঙালীরা দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারায় সাম্প্রদায়িক ও আপত্তিজনক শ্লোগান দিয়ে জুম্ম অধ্যুষিত বাবু পাড়ায় প্রবেশ করে। আবার নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজার অজুহাতে নিউ লাল্যাঘোনা ও উগলছড়ি মুখ গ্রামে আর্মিরা এক অপারেশন চালায়। এই অপারেশনে আর্মিরা ১০ জন জুম্মকে বেদম প্রহার ও ৭টি জুম্ম বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। প্রহৃত জুম্মরা হলো— (১) বিজয় দত্ত চাকমা ২৭, পীং বিপিন কুমার চাকমা (২) জুনু দত্ত চাকমা ১৮, পীং ঐ (৩) শংকর চাকমা ৩৫, পীং সুর কুমার চাকমা (৪) শ্যামল মিত্র চাকমা, ২২, পীং রবীন্দ্র কুমার চাকমা (৫) আলোময় চাকমা ২৩, পীং সুরেশ কুমার চাকমা (৬) সুভাশীষ চাকমা ১৮, পীং ঐ (৭) নিভাশীষ চাকমা ১৮ পীং ললিত চন্দ্র চাকমা (৮) রামচন্দ্র চাকমা ১৮, পীং রাঙাচোগা চাকমা, (৯) চিজি মুনি চাকমা ১৯, পীং সন্তোষ বিমল চাকমা (১০) কানন চাকমা, পীং কৃপা মোহন চাকমা এবং যাদের বাড়ী পোড়ানো হয়েছে তারা হলো — (১) দাদিরাম চাকমা ৪০, পীং তরুনি মোহন চাকমা (২) রাঙাচোগা চাকমা ৫০, পীং বড়পেদা চাকমা (৩) সান্তনাময় চাকমা ২২, পীং চিক্‌ক চাকমা (৪) কৃপা মোহন কার্বারী ৭৫, পীং জগৎ চন্দ্র কার্বারী (৫) নম গোপাল চাকমা ৪৮, পীং বড়পেদা চাকমা (৬) কাসমির চাকমা ৩২, পীং সাধন কুমার চাকমা (৭) জয় কুমার চাকমা ৩৫, পীং ললিত চন্দ্র চাকমা।

একদিকে সেনাবাহিনীর অপারেশন ও অন্যদিকে বাঙালী-ছাত্র-ঐক্য পরিষদের সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে স্থানীয় জুম্ম জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকার জন্য জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করেছে।

পরিশেষে রাঙ্গামাটি থেকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এর উপস্থিতিতে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায় বলে জানা গেছে।

কালো দিবস উদযাপিত

গত ১৫ই মার্চ, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে কালো দিবস উদযাপিত হয়েছে। গত বৎসরের এই দিনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান শাখার বার্ষিকীতে সেনা ও পুলিশের সহযোগিতায় পার্বত্য গণপরিষদের নগ্ন হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রেক্ষিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এই কালো দিবস উদযাপন করে। উল্লেখ্য, গত বৎসরের এই হামলায় শতাধিক জুম্ম আহত ও দুই শতাধিক জুম্ম গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। বান্দরবান বাজার মাঠে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা উষমং মার্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অপশক্তি প্রতিরোধ দিবসের সম্মেলনে বান্দরবানের কয়েক সহস্র জুম্ম-ছাত্র-জনতা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন পিসিপি সভাপতি কে এস মং মার্মা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী উমেচিং ও পৌর কমিশনের সদস্য প্যাসা মং মার্মা।

রাঙ্গামাটিতেও এই দিনে কালো দিবস উপলক্ষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বনরুপা পেট্রোল পাম্পে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপি রাঙ্গামাটি শাখার সভাপতি মৃগাংগ খীসা এবং বক্তব্য রাখেন পিসিপি যুগ্ম সম্পাদক দীপ্তি শংকর চাকমা ও পাহাড়ী গণপরিষদের নেতা নির্মল চাকমা প্রমুখ।

অনুপ্রবেশ অব্যাহত

বর্তমান যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সরকার মুসলমান বাঙ্গালীদের অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন অব্যাহত রেখেছে। বিগত এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে পানছড়ি থানার লোগাং বিডিআর ক্যাম্পের পাশে পুরাতন (চাকমা) গুচ্ছগ্রামে শতাধিক মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে সরকারী উদ্যোগে এরুপ পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। এই পুনর্বাসনের সময় স্থানীয় হেড্‌ম্যান সুরধন রোয়াজার সম্মুখে সরকারী কানুনগো এসে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বসত বাড়ীর জমি বন্টন করে দেয় এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য চতুর্দিকে চারটি অতিরিক্ত বিডিআর সেন্টি পোষ্ট স্থাপন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত স্থানে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ভারতের ত্রিপুরা থেকে স্ব-উদ্যোগে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের বসতি ছিল। লোগাং হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ঐ চাকমাদের সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয়। এইবারে সেই স্থানে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন দিয়ে স্থানটি বেদখল করা হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বুদ্ধমূর্তি ভাংচুর

অতি সম্প্রতি রোড প্রোটেকশনে কর্তব্যরত সেনারা পানছড়ি থানার অন্তর্গত মিলন শক্তি বৌদ্ধ বিহার (মন্দির) এর দুটি বুদ্ধমূর্তি ভাংচুর করে ধর্মীয় পরিহানির এক চরম নজির স্থাপন করেছে। খবরে জানা যায় যে,বিগত ২৫শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ১৯৯৬ ইংরেজী দুপুর ১২-১০ ঘটিকার সময় ৪১ নং ইবিআর এর শনটিলা আর্মি ক্যাম্পের হাবিলদার মোহাম্মদ আজিজ

এর নেতৃত্বে ৫ (পাঁচ) জন সেনা রোড প্রোটেকশনে কর্তব্যরত অবস্থায় উক্ত মিলন শক্তি বৌদ্ধ বিহারে ভিতরে বিনানুমতিতে-জুতা পায়ে প্রবেশ করেছিল এবং বিনা কারণে দু'টি বুদ্ধমূর্তি লাঠি মেরে ভেঙ্গে ফেলে দেয়। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে স্থানীয় জুম্ম-ছাত্র-জনতা এই পরধর্ম অসহিষ্ণুতার জন্য জোর প্রতিবাদ করে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানায়ে থাকে। উক্ত ঘটনা যাচাই এর জন্য ৪১ নং ইবিআর এর জোন কম্যাণ্ডার লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মতি, ক্যাপ্টেন মোহাম্মুদ ইকবাল এবং কয়েকজন সেনা অফিসার সহ সরজমিনে তদন্ত করেন। তদন্ত করে সেনা কর্মকর্তারা পরিস্কারভাবে জানতে পেরেছে যে, উক্ত জঘন্য ঘটনাটি হাবিলদার মোহাম্মদ আজিজের নেতৃত্বেই সংঘটিত হয়েছে। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মতি তাৎক্ষণিকভাবে এলাকার জনগণের নিকট উক্ত ঘটনা প্রকাশ ও প্রচার না করার জন্য অনুরোধ করেন। তা ছাড়া হাবিলদার আজিজও বুদ্ধমূর্তি ভাঙার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিহার কমিটির নিকট ১০০ (একশত) টাকা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে থাকে।

আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত দিনে ধর্মপ্রাণ দায়িকা ধনপতি চাকমা বিহারে প্রবেশ করার কারণে তার সাথে সেনা সদস্যরা অশালীন ব্যবহার করে। অবশেষে লেঃ কর্নেল মতি ও অন্যান্য সেনা অফিসারেরা আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বোঝাপড়ার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু জুম্ম ছাত্র-জনতা তা প্রত্যাখান করে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়।

মিলন শক্তি বৌদ্ধ বিহারের ভগ্ন ও পতিত বুদ্ধমূর্তি!

[১নং বুদ্ধ মূর্তির গলা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং ২নং বুদ্ধ মূর্তি লুঠিয়ে ফেলে দেয়া হয়।]

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

শুভেচ্ছা মূল্য—৩ টাকা